আইনমন্ত্রীর অনভিপ্রেত বক্তব্য

সিদ্ধান্তকৃত বিষয়ে বিতর্কিত বক্তব্য প্রদান

কোনো বিবেচনাতেই কাম্য হতে পারে না

আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে এ ব্যাপারে সরকারের অবস্থান সম্পর্কে ভুলবার্তা ছড়িয়ে পড়ার সমূহ আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির মহিলা শাখা আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি বলেছেন, উচ্চ আদালত যদি কোনো নির্দেশনা প্রদান করেন, তাহলে সরকার সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাদ দেয়ার উদ্যোগ নেবে। শুধু একথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি উচ্চ আদালতে এ সংক্রান্ত মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তি করতে আইনজীবীদের আরও সক্রিয় হওয়ার তাকিদও দিয়েছেন। একই সঙ্গে এই আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন যে, সংবিধানে যে সব সাংঘর্ষিক বিষয় রয়েছে সে সম্পর্কে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিসহ স্বাধীনতার সপক্ষের সংগঠনগুলো সুনির্দিষ্ট দাবী উত্থাপন করলে সরকার তা বাদ দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। আইনমন্ত্রীর এই গোটা বক্তব্যকে তার ব্যক্তিগত অভিমত বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। আবার তার বক্তব্যে সরকারের অবস্থান ও অভিমতেরই যে প্রতিফলন ঘটেছে, একথা মেনে নেয়াও কঠিন। ইতোপূর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সরকারের নীতি-নির্ধারকদের অনেকেই সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখার পক্ষে দৃঢ় ও স্পষ্ট অভিমত দেন। এ সব অভিমতের ভিত্তিতে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা ও নির্দেশে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বহাল রয়েছে। এ সম্পর্কিত সম্যক তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও আইনমন্ত্রী এরকম তর্কযোগ্য ও বিভ্রান্তিজ্ঞাপক বক্তব্য কিভাবে দিতে পারেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। সিদ্ধান্তকৃত ও প্রশ্নাতীত বিষয়ে এ ধরনের বক্তব্য প্রদান একাধারে উদ্দেশ্যমূলক ও দুর্ভাগ্যজনক। সঙ্গতকারণেই এ নিয়ে সরকারের স্পষ্ট করে বক্তব্য দেয়া অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। হয় সরকারকে আইনমন্ত্রীর বক্তব্য স্বীকার করে নিতে হবে, আর না হয় প্রত্যাখ্যান করতে হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অবশ্যই আইনমন্ত্রীকে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিতে হবে। সরকার নিশ্চুপ থাকলে তার সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে– বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। সরকারের ওপর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম রাখা না রাখার বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়। এটা বৃহত্তর জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিবেচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকার, সরকারী দল এবং বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রীর সবদিক বিবেচনা করে দেয়া অভিমতের ভিত্তিতেই সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বহাল রাখা হয়েছে। যখন সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম থাকবে কি থাকবে না এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন উপলক্ষে বলেন, এ দু'টি বিষয় সংবিধানে বহাল থাকবে। বিচার ও সংসদ বিষয়ক সংসদীয় কমিটিকে তিনি যে পরামর্শ দেন তাতে এ দু'টি বিষয় বহাল রাখার কথা বলেন। সংসদীয় কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এ সম্পর্কে বলেন, প্রধানমন্ত্রী সর্বস্তরের জনগণের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ও রাষ্ট্রধর্ম রাখার পক্ষে মতামত দেন। আওয়ামী লীগের তরফে প্রধানমন্ত্রী জানান, তার দল সংবিধান সংশোধন করতে চাইলেও তা থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও সংবিধানের শুরু থেকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বাদ দিতে চায় না। সংবিধান সংশোধনের জন্য গঠিত বিশেষ সংসদীয় কমিটির উপনেতা বেগম সাজেদা চৌধুরী জাতীয় সংসদে কমিটির যে ৫১ দফা রিপোর্ট পেশ করন তার ১ নম্বর দফায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ও ৩নং দফায় রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখার সুপারিশ করা হয়। অতঃপর সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাসের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সংবিধানে আগে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলামসহ যা কিছু ছিল, সবই অক্ষুণ্ন রয়েছে। কোনো কিছুই বাদ দেয়া হয়নি। প্রশ্ন হলোঃ এত কিছুর পরও আইনমন্ত্রী এখন এ কি বলছেন? আইনমন্ত্রী, বলার অপেক্ষা রাখে না, বিভিন্ন সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষা, ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম, ইসলামী রাজনৈতিক দল ইত্যাদি সম্পর্কে বিতর্কিত বক্তব্য দিয়ে ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয়েছেন। সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর মতামতের সঙ্গে তার মতামতের সাংঘর্ষিক অবস্থান প্রায়ই সরকারকে বিপাকে নিক্ষেপ করেছে, বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। প্রধানমন্ত্রী বাধ্য হয়ে তাকে সময়ে সময়ে সতর্ক করেছেন। গত বছর সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও ধর্মভিত্তিক দল সম্পর্কে কোনো কথা বলতে আইনমন্ত্রীকে নিষেধ করে দেন। আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা পোষণ করে বিতর্ক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বক্তব্য প্রদান থেকে আইনমন্ত্রীর বিরত থাকা উচিত ছিল। সে ঔচিত্যবোধের পরিচয় তিনি দিতে পারেন নি বা পারছেন না। আমরা লক্ষ্য করে আসছি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল

কমিটি, সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম এবং বাম ধারার কিছু সংগঠন সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম রাখার বিরোধিতা করে আসছে আগা গোড়া। কিন্তু সরকার, সরকারী দলসহ কোন মহল থেকেই তাদের বিরোধিতা সমর্থিত হয়নি। প্রধানমন্ত্রী তাদের দাবী ও বক্তব্য আমলে আনার এতটুকু প্রয়োজন বোধ করেন নি। অথচ আইনমন্ত্রী একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিসহ স্বাধীনতার সপক্ষের সংগঠনগুলোকে আশ্বাস দিয়েছেন, তাদের উত্থাপিত সুনির্দিষ্ট দাবী মেনে সংবিধান থেকে তা বাদ দেয়া হবে। এতে মনে হয়, তিনি যেন পক্ষে নন, ওইসব সংগঠনের পক্ষ হয়েই কথা বলেছেন। এমনিই দেশে বিতর্কের অভাব নেই। আইনমন্ত্রী নতুন করে আরেকটি বিতর্কের উদ্বোধন করেছেন। অবিলম্বে এই বিতর্কের অবসান কাম্য। আশা করি, সরকারের তরফে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে আমরা জানিয়ে রাখতে চাই, সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম একটি সেটেল্‌ড বিষয়। এ দু'টি বিষয় বাদ দেয়া জনগণ কোনোভাবেই মেনে নেবে না।

উচ্চ আদালতে বিচার প্রসঙ্গে

জনগণের আস্থা ও ভরসা

সুরক্ষা করতে হবে

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে আদালতকে গণ্য করা হলেও বিচার বিভাগ বিশেষ করে, হাইকোর্টের বিচারকদের সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দেশের প্রবীণ, প্রাজ্ঞ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক গত শনিবার রাজধানীতে এক সেমিনারে মন্তব্য করেছেন যে, দেশে আইন অনুযায়ী বিচার হয় না। কে কোন রাজনৈতিক দলের, আইনজীবী কে আছেন, বিচারকদের কাছে এগুলো বিবেচ্য বিষয় হয়ে গেছে। বিশেষ করে, হাইকোর্টে মানুষ দেখে বিচার হয়, আইন দেখে বিচার হয় না। বিচারপতিরা আইনজীবী হিসেবে কে আছেন, কে মামলার বাদী, তারা কোন দলের– এসব বিষয় বিবেচনা করে বিচার করছেন। তিনি আরও বলেছেন, ফেইজভ্যালু অ্যাড করার জন্য মামলায় আইনজীবী সিনিয়র আইনজীবীদের আদালতে বসিয়ে রাখছেন। এর কারণ, অধিকাংশ বিচারপতি রাজনৈতিকভাবে নিয়োগ পাচ্ছেন– বিশেষ করে, গত দু'বছরে যেসব বিচারপতি নিয়োগ পেয়েছেন। তিনি আইন দেখে বিচার করতে ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বিচার বিভাগের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বিচারকরা যদি এভাবে মুখ দেখে বিচার করেন তাহলে জনগণের কাছে 'এক্সেস টু জাস্টিস' (সুশাসন প্রতিষ্ঠা) ঢুকবে কিভাবে? পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, মানুষের ভরসার স্থল হিসেবে দীর্ঘদিন থেকেই আদালতের উন্নত ভাবমর্যাদা আমরা দেখে আসছি। এই মর্যাদার কারণেই অনেক বনেদি পরিবারের সন্তানসহ তরুণ সমাজ আইন পেশায় আসছে। আদালতের সর্বোচ্চ ও নিরপেক্ষ অবস্থান ঠিক রাখতে হবে। সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন আইনই প্রতিফলিত হয়। কোন রাজনৈতিক দলের ইচ্ছার প্রতিফলন যেন না ঘটে।

বিচারের সাধারণ কনসেপ্ট হলো, হাজার জন অপরাধী বেরিয়ে যাক তাতে দোষ নেই, কিন্তু একজন নিরপরাধীও যেন সাজা না পায়। বিচারে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার স্বার্থেই বলা হচ্ছে, দ্রুত বিচার, বিচারকে সমাহিত করার সমান। আর বিলম্বিত বিচার, বিচার অস্বীকারের নামান্তর। বিচারকরা যেহেতু তাদের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ, সে কারণেই বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা, বিচারকদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতার ওপরই নির্ভরশীল। ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া জনগণের আর কোন বিকল্প নেই। বাস্তব হচ্ছে, যে কোন কারণেই হোক, গত কিছু দিন থেকে আদালতের বিচার নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। সাধারণভাবে মনে করা হয়, শাসন বিভাগ কর্তৃক সাধারণের উপরে অবিচার করা হলে বিচার বিভাগে গিয়ে তার প্রতিবিধান সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে যেন তার বিপরীত চিত্রই প্রতিফলিত হচ্ছে, যা বিশিষ্ট আইনজীবীর বক্তব্য থেকেও উঠে এসেছে। কাগজপত্রে যাই হোক, সাধারণ মানুষের মনেও বিচার বিভাগ নিয়ে আস্থার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। নানা প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্ট বারের সাথে সর্বোচ্চ আদালতের সম্পর্ক স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, তা বলা যাবে না। জনমনে উত্থাপিত অনেক প্রশ্নকে তুলে ধরেছেন ব্যারিস্টার রফিক-উল হক। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের টাকা নেয়ার কড়া সমালোচনা করে তিনি মন্তব্য করেছেন, বিচারপতিদের টাকা নেয়া সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। তাহের পুত্রের প্রাণদণ্ড মওকুফ বিষয়ে তিনি বলেছেন, এমনি চলতে থাকলে আইনের প্রতি মানুষের ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না। গত বছর উচ্চতর আদালতের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন, সময় ও হাওয়া বদলের সাথে সাথে আদালতের রায়ও বদলে যায়। এ সংস্কৃতি বন্ধ করা না গেলে দেশে গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। জাতির অভিভাবক হিসেবে বিচার বিভাগ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতালব্ধ উদ্বেগজনক বক্তব্যের পরও পরিস্থিতির যে কোন পরিবর্তন হয়নি সেটাই প্রমাণ করছে তার গত শনিবারের মন্তব্য। সুতরাং, উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে।

ন্যায়বিচার প্রশ্নবিদ্ধ হলে তার দায় যুগ যুগ এমনকি শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত বহন করতে হয়। মনীষী সক্রেটিসের বিরুদ্ধে

পক্ষপাতদুষ্ট রায় দেয়ার জন্য সে সময়ের বিচারপতিরা আজ পর্যন্ত সমালোচিত হচ্ছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, সামরিক আইন জারি বা বিপ্লব করে অনেক কিছুই হয়ত করা যায়, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তা টিকে থাকে না। আদালত মানুষের আস্থার স্থান, পবিত্র অঙ্গন। দলীয় আনুগত্যের বিবেচনায় কোন বিচারক নিয়োগ পেতে পারেন, কিন্তু বিচারকের আসনে বসার পর তিনি বিচারক। বিচারের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও আইন ছাড়া তার অন্য কোন বিবেচনা থাকা উচিত নয়। ভবিষ্যতের জন্য ভালো উদাহরণ সৃষ্টি করা দরকার। সংশ্লিষ্ট সকলেরই মনে রাখা প্রয়োজন, রাজনৈতিক ক্ষমতা অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল। আজ যিনি ক্ষমতায় আছেন, কাল তিনি নাও থাকতে পারেন। কিন্তু আদালত স্থায়ী। সে কারণেই সতর্ক থাকতে হবে। আদালতের সর্বোচ্চ ও নিরপেক্ষ অবস্থান ঠিক রাখতে হবে।

নানা সংকটে মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকেছে

আবদুল আউয়াল ঠাকুর

দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে শৃঙ্খলার অভাব প্রকট। তবে কৃষি উৎপাদনে সফলতার কারণে গ্রামীণ সমাজে কিছুটা স্বস্তি এখনও বহাল আছে। সীমিত আয়ের মধ্যবিত্তের অবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশ নাজুক। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নেমে গেছে। রেমিট্যান্স আগের জায়গায় নেই। শেয়ারবাজারে ভালো খবর কবে আসবে, কারো জানা নেই। অর্থকরী ফসলের উৎপাদন অবস্থা কোন বিবেচনাতেই স্বাভাবিক নয়। এই বাস্তবতায় বিশ্বব্যাংকের বাজেট সহায়তায় অর্থঋণ প্রদান না করা, পদ্মা সেতুর অর্থ বরাদ্দ স্থগিত রাখা এবং গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে চীনের সর্বাত্মক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া না থাকার প্রেক্ষিতে অর্থনীতিতে নানামাত্রিক সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে। যুক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে মূল্যস্ফীতি। মূল্যস্ফীতি রোধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বেতন বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে কোন কাজে আসছে না। সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। পরিস্থিতির বিবেচনায় অর্থনীতিবিদ-বিশ্লেষকগণ যখন সরকারকে কৃচ্ছ্রতা সাধনের পরামর্শ দিচ্ছে তখন বাস্তবে ঘটছে তার উল্টোটা। সে কারণেই আগামী দিনগুলো কেমন যাবে, এ ভাবনায় পেয়ে বসেছে প্রায় সকলকে।

আমাদের অর্থনীতির ঐতিহ্যবাহী তিন সম্পদের অবস্থাই নাজুক। অর্থনীতিতে পাটের সুস্পষ্ট অবদান থাকা সত্ত্বেও বিপাকে পড়ছে পাট চাষীরা। হাটে পাট এনে বিক্রি করতে পারছে না। অনেকে মনের দুঃখে পাট পুড়িয়ে ফেলছে। কেউ কেউ পানিতে ফেলে দিচ্ছে। রফতানীকারকরা গুদামে পাট নিয়ে বসে আছে। দেশে-বিদেশে অব্যাহতভাবে পাটের দাম কমছে। সরকারী দলের নির্বাচনী ইস্তেহারে পাটের সোনালী দিন ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে কোন উদ্যোগ নেই। বাংলাদেশ জুটমিল এসোসিয়েশনের সভাপতি বলেছেন, সরকার পণ্যের মোড়ক হিসেবে পাট পণ্যের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে আইন করেছিল। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, এই আইন বাস্তবায়িত হলে দেশে উৎপাদিত পাটের ৬০ শতাংশ দেশের শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত হবে। এখন পর্যন্ত এই আইনের বাস্তবায়ন শুরুই হয়নি। অথচ ভারত এই আইন বাস্তবায়ন করে উৎপাদিত পাটের ৯০ শতাংশই নিজের বাজারে ব্যবহার করছে। এই হার বাংলাদেশে মাত্র ৫ শতাংশ। পাটের মতোই উন্নতমানের চামড়া উৎপাদিত হলেও সে খাতের অবস্থাও নাজুক। বাংলাদেশে চামড়া পাওয়ার সবচেয়ে বড় মৌসুম হচ্ছে কোরবানীর ঈদ। সদ্যসমাপ্ত এই ঈদের পর চামড়া সম্পর্কে বলা হচ্ছে, ট্যানারি মালিকরা এ বছর দাম বেঁধে না দেয়ায় চামড়ার বাজারে ধস নেমেছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কাঙ্ক্ষিত দাম না পেয়ে চামড়া নিয়ে বিপাকে পড়েছে। কোরবানীর পশুর চামড়া ক্রয়ে আড়তদারদের অনীহার কারণে বিপুল পরিমাণ চামড়া নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গুদাম ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছে, আর্থিক সঙ্কট ও নিয়ন্ত্রণহীন বাজারে চামড়া বিক্রির সুযোগ না পাওয়ায় তারা চামড়া ক্রয়ের ঝুঁকি নিচ্ছে না। এদিকে পাট ও চামড়া সীমান্তে বিশেষ এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে বেশী দাম দিয়ে নিয়ে নিচ্ছে ভারত। সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে, আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও চামড়া থেকে যদি অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের কোন সুযোগ না থাকতো তাহলে অধিক মূল্য দিয়ে ভারত নিচ্ছে কেন? এ আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, বাংলাদেশ তার নিজের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে নিজের সম্পদ নিজে রাখতে পারছে না কেন? চীন-ভারতসহ যেসব দেশের সাথে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পেয়েছে এবং পেতে যাচ্ছে সেসব দেশে এখন পর্যন্ত প্রধান রফতানী পণ্যের মধ্যে পাট, চা, চামড়া রয়েছে। যদি আমরা উৎপাদন করতে না পারি তাহলে বাণিজ্য সুবিধা কাগুজে সুবিধার বাইরে কিছুই থাকবে না। পাট ও চামড়াকে কেন্দ্র করে দেশে কর্মবিনিয়োগ এবং আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বীকৃত যে প্রসঙ্গ রয়েছে সে আলোচনা না হয় থাকলই। এক সময় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী জনপ্রিয় পানীয় চা এখন ধীরে ধীরে

আন্তর্জাতিক বাজার হারাতে বসেছে। বাংলাদেশের চা একসময় ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, কেনিয়া, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে রফতানী হলেও এখন চা আমদানী করা হচ্ছে। প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের চায়ের দাম বেশী থাকার কারণে রফতানী করা যাচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছে। উৎপাদন কমে যাওয়াও রফতানীতে ভাটা পড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করা হয়। উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, সরকারীভাবে চা শিল্পের জন্য কোন প্রকার আর্থিক সহায়তা নেই। এডিপিতে এ খাতের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। দেড়শ' বছরের পুরনো এই চা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রকৃতপক্ষে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার কোন বিকল্প নেই। বিশ্বমন্দার প্রেক্ষিতে তৈরী পোশাক শিল্পের অবস্থাও খুব একটা সন্তোষজনক নয়। বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ একটু বাড়লেও তুলনামূলক বিচারে আশার কোন আলো নেই। আমদানী নির্ভরতার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভেও টান পড়েছে। এই অবস্থায় সরকার সব ধরনের জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করেছে। এও বলা হচ্ছে, ডিজেলের বর্ধিত মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সঙ্কুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস সিএনজির দামও বাড়ানো হবে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি পুরোপুরি কার্যকর হবার আগেই দেশ ভয়াবহ মূল্যস্ফীতির কবলে পড়েছে। প্রতিমাসেই আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে মূল্যস্ফীতির সূচক। অর্থনীতিবিদগণ একটি দেশের জন্য ৭ মাত্রার মূল্যস্ফীতিকে অস্বাভাবিকভাবে মনে করলেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী সেপ্টেম্বরের মূল্যস্ফীতি প্রায় ১২ শতাংশের কোটা স্পর্শ করেছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে, গত ১ দশকে দেশে মূল্যস্ফীতির এই হার সর্বোচ্চ।

সুনির্দিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুর অর্থায়ন স্থগিত ও বাজেট সহায়তা ঋণ না দেয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে অর্থবছরের শেষে তা ৩০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে বলা হয়েছে। অন্যদিকে ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর সরকার অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় মূল্যস্ফীতি আরও বাড়ার পাশাপাশি বিনিয়োগ আরও কমে যাবে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সরকারের বেপরোয়া ঋণ গ্রহণের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন না হলে চলতি মাসের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে। অথচ এখনও চলতি অর্থবছরের আরও প্রায় ৭ মাস পড়ে আছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সরকারের অর্থব্যয়ে ভারসাম্য না থাকায় অর্থ যোগানের একমাত্র ভরসা হয়ে উঠেছে ব্যাংক। অন্য খবরে বলা হয়েছে, কেবল অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নয়, অর্থসংস্থানের জন্য সার্বভৌম (সভরেন) ঋণের জন্য বিদেশী ব্যাংকের সাথেও যোগাযোগ করা হচ্ছে। এর আগে বাংলাদেশ কখনও এ ধরনের ঋণ নেয়নি। এ ধরনের ঋণ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এই ঋণের জালে একবার ঢুকলে তা মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক কাঠামোকেই বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় টানাপোড়েন, ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতি এবং বৈদেশিক লেনদেনের ওপর অত্যধিক চাপের কারণে সরকার যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠতে পারছে না।

বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ উপদেষ্টা মীর্জা আজিজুল ইসলাম খোলামেলাভাবেই বলেছেন, তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ রেন্টাল বিদ্যুৎ। হিসেবে গরমিল যাই থাক, ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের আগে জ্বালানি লাগতো প্রায় ৪০ লাখ মেট্রিক টন। এখন চাহিদার কথা বলা হচ্ছে ৬৮ লাখ মেট্রিক টন। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, রেন্টাল বিদ্যুতের জন্য সাধারণ জনগণকে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে কেন? এখানে এ আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, বিদ্যুৎ ঘাটতির কথা বলে ডিজেল চালিত রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলেও চীন থেকে শুরু করে বিশ্বের বহু দেশ এখন পর্যন্ত কয়লা দিয়েই বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। উন্নতমানের কয়লা থাকা সত্ত্বেও তা উত্তোলনে যেমন নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তেমনি ওই কয়লা দিয়ে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনেও তেমন কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অনেকের মতে, পরিবেশ দূষণের যে প্রসঙ্গ এখানে উঠছে তাকে যদি আমলে নিতে হয় তাহলে অবশ্যই উন্নত বিশ্ব ইতোমধ্যেই তাদের ভোগবাদিতার কারণে বিশ্বে যে পরিমাণ উষ্ণায়ন সৃষ্টি করেছে তার মাশুল কড়ায়গণ্ডায় পরিশোধ করা প্রয়োজন ছিল। সে ব্যাপারে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত বিশ্বের কোন আগ্রহ না থাকায় আমাদেরও সঙ্গতভাবেই অনেক কিছু ভাববার রয়েছে। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির পক্ষে তেমন কোন শক্তিশালী যুক্তি নেই। ডিজেলের সূত্র ধরে সিএনজির মূল্যবৃদ্ধির যে আলোচনা সেটাও অর্থহীন। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলা হয়েছে, সিএনজির মূল্য কম রাখায় পরিবহন খাতের মূল্য কম হবে বলে মনে করা হয়েছিল। বাস্তবে তার কোন প্রভাব না পড়ায় সরকার সিএনজির মূল্য ডিজেলের সমান করতে চাচ্ছে। বিষয়টি হাস্যকর। কারণ পরিবহন খাতে এখন পর্যন্ত যতটুকু নৈরাজ্যবিহীন অবস্থা রয়েছে তা সিএনজির কারণেই। অন্যদিকে ঢাকার বায়ুর পরিবেশ রক্ষার স্বার্থেই ডিজেল দূষণ থেকে রক্ষা করতে সিএনজির ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কার্যত সিএনজির মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে যে যুক্তি

দেখানো হয়েছে তা অন্ধের হাতি দর্শনের মতোই। অনেকে মনে করেন, সরকারী এ সিদ্ধান্তের পিছনে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। জ্বালানি তেলের আমদানীর পরিমাণ নিয়েও নানা গরমিল রয়েছে। এটাই সত্য যে, বাংলাদেশে প্রতিবছর কত খাদ্য আমদানী করতে হয় তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। প্রতিটি আমদানীর ক্ষেত্রে এরকম গরমিল থাকার মধ্যেই দুর্নীতির নানা উপাদান রয়েছে। হিসাব-নিকাশ যাই থাক, তথ্যবিবরণী অনুযায়ী সরকার যদি সব ধরনের জ্বালানির ওপর ভর্তুকি তুলে নেয় তাহলে বাজারের এবং মধ্যবিত্তের অবস্থা কি দাঁড়াবে সেটা বোধকরি লিখে বুঝাবার কোন প্রয়োজন নেই।
জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির সাথে চাঁদাবাজি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ যুক্ত হয়ে এর মূল চাপ জনগণেরও উপরই পড়বে। পানি যেমন নিম্নমুখী হয় তেমনি বাংলাদেশের অবস্থাও এমনই যে, সবকিছুর চাপই শেষ পর্যন্ত নিরীহ এবং আইন মান্যকারী জনগণকেই সহ্য করতে হয়। শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষেত্রেও একটি গুরুতর অনিয়ম বহাল রয়েছে। যারা নিয়মিত কর দেয় তাদেরই মূলত যারা কর দেয় না বা ফাঁকি দেয় তাদের করও দিতে হয়। যারা নিয়মিত সব ধরনের বিল পরিশোধ করে তাদেরও সিস্টেম লস তথা যারা ফাঁকি দেয় তাদের টাকাও পরিশোধ করতে হয়। এরকম আরও অনেক খাত আছে যেখানে নিয়ম মানাটাই যেন একটা বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাদের ক্ষমতার প্রভাব বলয়ে কেউ নেই, আইনের নানা ফাঁকে পড়ে তাদেরই নানা নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এই প্রবণতাও বাংলাদেশের মূল্যবৃদ্ধির উপর প্রভাব ফেলছে। প্রকৃত অর্থে চারদিকে কোন সুসংবাদ নেই। আইন-শৃঙ্খলার ভয়াবহ অবনতি ও মূল্যস্ফীতির কারণে বিপর্যস্ত জনগণ। আর এই অবস্থায় জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে জনগণকে আরেক দফা মূল্যবৃদ্ধির পাকে ফেলা হচ্ছে। বাস্তব অবস্থা হয়েছে বহু শিল্প বন্ধ, জনগণ দিশেহারা, বাড়ছে সরকারী ঋণের পরিমাণ। সঙ্কীর্ণ দলীয়করণ, অযোগ্য-অদক্ষতা, দুর্নীতি, গোষ্ঠীপ্রীতি লুটপাটের মানসিকতার কারণেই সামগ্রিক পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাচ্ছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নরবৃন্দ, অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্লেষকগণ সরকার গৃহীত নীতিকে সমর্থন করছেন না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন ড. ফসিহউদ্দিন মাহাতাব। তিনি মনে করেন, এই রীতির মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে মূল্যস্ফীতিতে। সরকারের কৃচ্ছ্রতা সাধনের পক্ষেই সংশ্লিষ্টরা অভিমত ব্যক্ত করছেন। অথচ পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী, আসছে নতুন বছরে রাজনৈতিক অঙ্গনে সরকারবিরোধী কর্মসূচী মোকাবেলায় সারাবছরই নির্বাচন অনুষ্ঠানের কৌশল নেয়া হয়েছে। সরকারের নীতিনির্ধারকরা জানিয়েছেন, আসছে নতুন বছরে অন্তত ৫টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। পাশাপাশি জেলা পরিষদে মৌলিক গণতন্ত্রের আদলে চেয়ারম্যান নির্বাচনে পরিকল্পনাও রয়েছে। সরকারের অন্যান্য উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা, বিদেশ ভ্রমণসহ অর্থব্যয়ের উচ্চ খাত নিয়ে আলোচনা না করাই সঙ্গত। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই, সরকার যখন ঋণে ডুবে আছে তখন যেকোন মূল্যেই কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং জনগণের ওপর অর্থনৈতিক চাপ কমানোর চেষ্টাই সঙ্গত।

প্রবন্ধ
ভূমিকম্প ঃ প্রয়োজন সতর্কতা ও সচেতনতা

আফতাব চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বহু প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। মানব সভ্যতার যাত্রা শুরুর পরে খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সালের পরবর্তীকালে প্রায় ১,০০০টা প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের তথ্য পাওয়া যায়। ৩৪২ সালে তুরস্কের আন্টাকিয়ায় এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে মারা যায় প্রায় ৪,০০০ ফৎথঁর। সর্বাধিক লোকের মৃত্যু ঘটে ১৫৫৬ সালের চীনের চাংচি অঞ্চলে সংঘটিত এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিমম্পে। মৃতের সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ। ১৯২০ সালে জাপানে সংঘটিত এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে মারা যান ২ লক্ষ লোক। ১৯২৩ সালে জাপানে সংঘটিত আরেক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে মৃত্যু হয় প্রায় দেড় লক্ষ লোকের এবং ধ্বংস হয় প্রায় পাঁচ লক্ষেরও অধিক ঘরবাড়ি।
এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত ভূমিকম্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৩৫ সালে পাকিস্তানের বালুচিস্থান, ১৯৮৮ সালে আর্মেনিয়া, ১৯৯০ ও ১৯৯৭ সালে ইরান, ১৯৯০ সালে ফিলিপাইনস, ১৯৯১ সালে

আফগানিস্তান ১৯৯২ সালে ইন্দোনেশিয়া, ১৯৯৫ সালে জাপান এবং ১৯৯৯ সালের ১৭ আগস্ট তুরস্কে সংঘটিত একটি প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প, মৃত্যু হয় প্রায় ১৬,০০০ লোকের। স্যার এডওয়ার্ড গেইটের লেখা 'A History of Assam' গ্রন্থে আসামসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংঘটিত বহু ভূমিকম্পের বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। ওই গ্রন্থে উল্লেখ করা মতে ১৫৪৮, ১৫৯৬, ১৬৪২, ১৬৯৬ এবং ১৭1৪ সালে আহোম রাজা রুদ্র সিংহের রাজত্বকালে আসামে প্রবল ভূমিকম্প হয় এবং বহু লোক হতাহত হয়। বিগত শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্পগুলো সংঘটিত হয় যথাক্রমে ১৯৮১, ১৯৩০, ১৯৫০, ১৯৭৬, ১৯৮৮ ও ১৯৯৫ সালে।

১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে অবিভক্ত আসামের কামরূপ, গোয়ালপাড়া দরং, নওগয়া এবং মেঘালয়ের শিলং ও বাংলাদেশের সিলেট জেলা নিয়ে প্রায় ৩,৮১.০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে বলতে গেলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ওই ভূমিকম্পে বরপেটা জেলার মন্দিরা, সরুক্ষেত্রী, পালহাজী, সর্থেবারী ইত্যাদি অঞ্চলকে জলাভূমিতে পরণত করে। ওই ভূমিকম্পের চেয়ে আরও প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল ১৯৫০ সালের ১৫ আগস্ট অপরাহ্নে। রিকটার স্কেলে যার মান ছিল ৮.৭। ওই প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে আসামের সুবর্ণশিরি, দিহিং এবং লোহিত নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয় এবং ব্যাপক ভূমিখলনের ফলে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়। ডিব্রুগড় শহরের বহু ঘর-বাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ওই শহর সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদের তলদেশ প্রায় ৩.৪ মিটার উচুঁতে উঠে যায়। শদিহা শহরের নিকটবর্তী এবং নদীর তলদেশ প্রায় ছয় মিটার উচুঁতে উঠে পড়ে যায়। ফলে নদীর পানিধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং এর ফলে বর্ষার প্রবল বন্যার কবলে পড়ে উজান আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

আসামে ঘটে যাওয়া প্রবল ভূমিকম্পের আগে ও পরে ভারতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। সেগুলোর মধ্যে যেমন কুমায়ুন (১৮০৩), হিমাচল প্রদেশের কাংড়া (১৯০৫), কাশ্মীরের শ্রীনগর (১৯২৪)। বিহারের মুঙ্গের (১৯৩৪), (১৯৮৮) এবং ১৯৯১ সালে ২৩ অক্টোবর উত্তর কাশীতে সংঘটিত (রিখটার স্কেল ৬.১) ভূমিকম্পে প্রায় এক হাজারেরও অধিক মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৯৭ সালের ২২ মে জব্বলপুরে সংঘটিত ভূমিকম্পে পঞ্চাশজন লোকের মৃত্যু হয় এবং বহু লোক আহত হয়। ১৯৯৯ সালের ২৩ এপ্রিল উত্তরাঞ্চলের চামলি রুদ্র প্রয়াগে ভূমিকম্পে শতাধিক লোকের মৃত্যু হয়। ১৯৯৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের লাটুর অঞ্চলের ভূমিকম্প (রিখটার স্কেল ৬) বিস্তর ক্ষতিসাধন করে এবং ওই ভূমিকম্পে প্রায় দশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়।

এরপর ২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের ৫২তম প্রজাতন্ত্র দিবসে গুজরাটের আহমাদাবাদ ও ভুজসহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প সংঘটিত হয় ওই ভূমিকম্পে প্রায় ত্রিশ হাজারের অধিক লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। কত হাজার হাজার অট্টালিকা যে ধূলিসাৎ হয়ে পড়েছে, তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে দূরদর্শনের পর্দায় ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যে ছবি ভেসে এসেছে তা থেকে গুজরাট ভূমিকম্পের ভয়াবহতা অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য হয় নি। রিখটার স্কেলে ওই ভূমিকম্পের পরিমাপ ছিল ৬.৯। গুজরাটের ভূমিকম্পের সম্ভাব্যতা নিয়ে ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে একটা সাবধানবাণী শোনা যায়।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ড: সৌমিত্র মুখার্জি আইআরএস-১ সি উপগ্রহ থেকে দূরসংবেদী তথ্য বিশ্লেষণ করে গুজরাট কোংকন কেরল ও উত্তরাঞ্চলে এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের সম্ভাব্যতার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। গুজরাটের এ ভয়াবহ ভূমিকম্পের মূলে হচ্ছে ওই রাজ্যে বিগত বছরের ঘটে যাওয়া ব্যাপক খরা। ড: মুখার্জি আরও ব্যক্ত করেছিলেন যে, সূর্যের থেকে নির্গত শক্তি যে স্থানে সর্বোচ্চ পরিমাণ সঞ্চিত হয় সে স্থানেই ভূমিকম্পের সম্ভাব্যতা থেকে যায়। উপগ্রহের ছবি থেকে দেখা গিয়েছিল এ শক্তির স্তর তা বেড়ে যাচ্ছিল ১৯৯৯ সাল থেকে। তবে এ সবই হচ্ছে অনুমান। ভূমিকম্পের সঠিক দিনক্ষণ ও স্থান নির্ধারণ করা সম্ভব হলে হয়ত বা গুজরাটের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি প্রতিহত করা সম্ভব হত।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ঃ এ কথা পষ্ট করে বলা যায় যে, ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস এবং তা প্রতিরোধ করা অতীতের মত অদূর ভবিষ্যতেও সম্ভব হয়ে উঠবে না। তবে বিজ্ঞানীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন উপগ্রহ ও অন্যান্য প্রযুক্তির মাধ্যমে যেভাবে ঝড়-বাদলের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে ঠিক সেভাবেই হয়ত একদিন ভূমিকম্পের পূর্বক্ষণে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। তবে ভূকম্পপ্রবণ অঞ্চলের যে দিকচিহ্ন রেখা বিজ্ঞানীরা অংকিত করেছেন আজ অবধি সে দিকচিহ্ন রেখার অভ্যন্তরেই ভূমিকম্প সংঘটিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তাই ভূমিকম্পের করাল গ্রাস থেকে কিভাবে ঘরবাড়ি ও জণপ্রাণী রক্ষা করা যায় সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

১৯৭৬ সালে চীনে টাংস্নেনে হওয়া বিধ্বংসী ভূমিকম্পে কমপক্ষে সাত লক্ষ লোক হতাহত হয়। প্রায় অর্ধেক লোকের মৃতদেহ পনেরো দিন পরেও ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়। বহু লোক চিকিৎসা ও

প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয়জলের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সে সময় চীনে সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ দুর্যোগ পরিচালন (Disaster Management) ব্যবস্থা ছিল না বলেই বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। ১৯৯৩ সালে ভারতের মহারাষ্ট্রের লাটুরে সংঘটিত বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পরে যদিও Disaster Management গঠন করা হয় কিন্তু এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ততটা গুরুত্ব দেয়নি, যার ফলে ২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারি গুজরাটে সংঘটিত বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব হয়নি এবং ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যে যথেষ্ট ত্রুটি ছিল বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

ভারতে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এতটাই অপারদর্শী যে, ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপের ভেতরে প্রাণস্পন্দন খুঁজে বের করতে সুইজারল্যান্ডের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সহায়তা নিতে হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বাধা দেওয়ার শক্তি মানুষের নেই কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব হয় যদি দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য সরকার, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, ছাত্রছাত্রী ও জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসে এবং এ জন্য জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। এ সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ১৯৯০-২০০০ সালের দশক 'বিশ্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির হ্রাসকরণ দশক' (International Decade for Natural Disaster Reduction IDRD) হিসাবে পালন করা হয়েছিল। ওই দশকে বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিচালন শাখা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ নিয়ে গঠন করা হয়। (১) প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দিয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করা (২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ (৩) সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে বাধাগ্রস্ত হতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ (৪) দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই তৎকালীন উদ্ধার ও সাহায্যের কাজে অগ্রসর হওয়া (৫) চিকিৎসা, খাবার পানি, খাদ্য ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা যাতে দুর্যোগাঞ্চলে বাধাগ্রস্ত হতে না পারে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ।

অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়ে ভূমিকম্পই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এ ভূমিকম্প অতি কম সময়ের মধ্যে বিস্তর ক্ষতি সাধন করে। শুধুমাত্র আমাদের সচেতনতা ও সাবধানতার অভাবের ফলেই ভূমিকম্পে এত জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধন হয়। আসাম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এবং বাংলাদেশ প্রবল ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে এবং এ অঞ্চল এবং এ অঞ্চলে যে কোনও মুহূর্তে একটা বড় ভূমিকম্প হতে পারে, এমন ধারণা বিশেষজ্ঞদের।

স্মরণ রাখতে হবে, ১৮৯৭ সালের বড় ভূমিকম্পের পরে আসামে ও সিলেট অঞ্চলে 'আসাম টাইপ' ঘরের নির্মাণ শুরু হয়েছিল যা পুরোপুরি ভূমিকম্প প্রতিরোধকারী হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমান প্রজন্মের লোকেরা 'আসাম টাইপ' ঘরের আবশ্যকতা প্রায় ভুলে গেছেন। রুরকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকম্প ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ভূমিকম্পের কম্পন প্রতিরোধকারী ঘরবাড়ি ও সেতু নির্মাণের পরামর্শ দিয়ে এক বিস্তৃত প্রতিবেদন তৈরি করেছে। জাপানে অবস্থিত International Association for Earthquake Engineering অনুষ্ঠানে ১৯৮৬ সালে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের ঘরবাড়ি নির্মাণের বিষয়ে একটা পুঁথি প্রকাশ করেছে। ভারতের মহারাষ্ট্রে লাটুর ভূমিকম্পের পরে রাজ্য সরকারের Earthquake Engineering Rehabilitation সংস্থাও ভূমিকম্পের কম্পন প্রতিরোধকারী ঘরবাড়ি নির্মাণের বিষয়ে পথপ্রদর্শক জাতীয় পুঁথি প্রস্তুত করেছে। মহারাষ্ট্রের পুনের Disaster Management-এর বৈজ্ঞানিক ড: বিনোদ মেননের মতে– 'Civic authority in urban centres located in earthquake prone areas have to seriously inforce building regulation and adopt earthquake resistant techniques such as lintel beams retrofiting and seismic strengthening.'

কিন্তু সাধারণত দেখা যায় Developement Authorityগুলোই এ কথাগুলো চিন্তাভাবনা না করেই ঘরবাড়ি তৈরির ব্লুপ্রিন্টের নক্সার কাগজপত্রের অনুমতি দেয়। ড: মেননের মতে, ১৯৯৯ সালের আগস্ট তুরস্কে হয়ে যাওয়া ভূমিকম্পের চেয়ে ওই বছর সেপ্টেম্বরে টার্বাইনে হওয়া ভূমিকম্পে ক্ষতি যথেষ্ট কম। এর একমাত্র কারণ ওই দেশের ঘর, ফ্ল্যাট ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে নেওয়া কঠোর নিয়ম ও নির্দেশিকা পালন। ২০০১ সালের গুজরাটে ভূমিকম্পে এত ঘর-বাড়ি ধ্বংসের মূলে ছিল ঘর-বাড়ি নির্মাণে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা মেনে না চলা। ইতিমধ্যে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করে মহারাষ্ট্রের লাটুর শহরটি ভূমিকম্প প্রতিরোধকারী শহর হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। লাটুর জেলাশাসক রাজীব জালোটা ঘর নির্মাণ বিষয়ে গর্ব করে বলেছেন– 'Their houses have lintel, beams dome shaped & roof, and thick iron netting in

their constructoin. this will enable them to withstand a quake of even seven on the Richter Scale.'

ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কায় অযথা আতঙ্কিত না হয়ে যাতে ভূমিকম্পের পরবর্তী দুর্যোগের মোকাবিলায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসাধারণের বিভিন্ন মহলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি। জেলা প্রশাসন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিধি বহির্ভূতভাবে নির্মাণ করা এবং ভূমিকম্প ডিজাইন না থাকা ঘর-বাড়িগুলো শনাক্ত করে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করাও উচিত।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট। বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার (১ম স্বর্ণপদক) প্রাপ্ত।

(সমাপ্ত)

এই দিনে ২৪ বছর আগে

ধূমপান ও শিশু

ধূমপায়ী পিতা-মাতার সাথে একই ঘরে থাকলে শিশুদের বড় হয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থাকে। বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানী ভার্জিনিয়া মেডিক্যাল কলেজের ডক্টর উইলিয়ম মস্কোভিজ এক সেমিনারে জানান, খুব সীমিত মাত্রার সিগারেটের ধোঁয়াও ১২ বছর বয়সী বালকের হার্ট ও রক্তে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং পরবর্তী সময়ে তাদের হৃদরোগের সৃষ্টি করে। (রয়টার)

দৈনিক ইনকিলাব, ২১ নভেম্বর ১৯৮৭

xxxxxxxxxxxxx